Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
UGC Enlisted Serial No. 48666
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-VII, Issue-I, July 2018, Page No. 58-63
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনের প্রেক্ষিতে মুক্তি

সুজিত মণ্ডল
আংশিক সময়ের অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, রামপুরহাট কলেজ

Abstract

Sanskrit moksa or Prakrit moksa means liberation or salvation. It is a blissful state of existence of a soul, completely free from the karmic bondage, free from samsara, the cycle of birth and death. The Cārvāka admits the existence of four elements--earth, water, fire and air- only, and he rejects the fifth, the ether, because it is not perceived but inferred. Similarly soul and god. According to the Cārvāka Philosophy Kama is the most important of the life. The Cārvāka admits that limited perceived instances instance cannot lead to unrestricted universal grangerization, it's the liberation of Cārvāka philosophy. Nirvana is a state of total freedom and no sufferings. With perfect knowledge, perfect peace and perfect wisdom. Man is free from all bondage in a state of nirvana . A liberation soul is soul to have attained isn't true and pristine nature of infinite bliss, infinite knowledge and infinite perception. Such a soul is called siddha is revered in Jainism .It Jainism, it is the highest and noblest objective that a soul should strive to achieve. That is why Jainism is also known as moksamarga of the path to liberation. So in this paper I want to highlight that liberation is the last stage of life. Which gives the pleasure from sorrowful life.

ভারতীয় দর্শনে মুক্তি বা মোক্ষের ধারণাকে বুঝতে গেলে 'দর্শন 'শব্দটির তাৎপর্য অনুধাবন করতে হবে। কেননা 'দর্শন'শব্দটির মধ্যেই ভারতীয় দর্শনের মূল চরিত্র অন্তর্নিহিত।সাধারণভাবে 'দর্শন'শব্দটির অর্থ হল দেখা বা জানা। কিন্তু যে কোন দেখা বা জানাকে দর্শন বলা যায় না। এখানে দেখা বা জানা বা জ্ঞানের অর্থ হল তত্ত্বজ্ঞান।এই তত্ত্বের স্বরূপ কি? ভারতীয় দার্শনিকদের মতে, এই তত্ত্ব আসলে আত্মতত্ত্ব। তবে এই তত্ত্ব ইন্দ্রিয় বা বুদ্ধির বিষয় নয়; বরং তা অতীব ধী-শক্তি সম্পন্ন মুনি-ঋষিদের তথা মানুষের উপলব্ধিতে প্রকাশিত হয়। আর তত্ত্বের এই উপলব্ধির নামই মোক্ষ। জ্ঞান এই উপলব্ধির উপায় মাত্র। তাইতো গীতায় জ্ঞান,কর্ম,ভক্তি ও যোগের সমন্বয়ের কথা বলা হয়েছে।

"ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্ম চেতসা।
নিরাশীর্নির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ"।।[১]

তাই সাধারণভাবে বলা যায়, ভারতীয় দার্শনিকদের মতে জীবের পক্ষে মুক্তি তথা মোক্ষ লাভ করা সম্ভব।

ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারটি হল পুরুষার্থ। এখানে পুরুষার্থ শব্দটিতে 'পুরুষ' বলতে সচেতন মানুষ এবং 'অর্থ' বলতে কাম্য বস্তু কে বোঝায়। কাজেই পুরুষার্থ বলতে সচেতন মানুষের কাম্য বস্তুকে বোঝায়।

কিন্তু প্রশ্ন জাগে মানুষের জীবনের কাম্যবস্তু বা লক্ষ্য কি? প্রায় সকল ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়ই দুঃখ নিবৃত্তি ও সুখ প্রাপ্তিকেই মানুষের জীবনের লক্ষ্য তথা কাম্য বস্তু বলে উল্লেখ করেছেন।

কাম, অর্থ ও মোক্ষ যে মানুষের দুঃখ নিবৃত্ত করে একথা সত্য। 'কাম' শব্দটি জৈব তৃষ্ণা নিবৃত্তিজনিত সুখকে বোঝায়। 'অর্থ' সাক্ষাৎ ভাবে সুখ উৎপাদন না করলেও তার দ্বারা কাম তৃপ্ত হয়।তবে ধর্মের দ্বারা পরিচালিত হয়ে যদি অর্থ ও কামের সঙ্গ করা হয় তাহলেই মোক্ষ লাভ সম্ভব।মোক্ষ হল যা কিছু বেদনা দায়ক ও দুখঃদায়ক তা থেকে চিরদিনের জন্য নিষ্কৃতি। উক্ত চারটি পুরুষার্থের মধ্যে প্রথম তিনটি পরম পুরুষার্থ তথা মোক্ষ লাভের উপায় স্বরূপ।

'মুক্তি' শব্দটি 'মুচ্' ধাতু হতে নিষ্পন্ন হয়েছে। পাণিনি বলেন 'মুচ্' ধাতুর অর্থ 'মোক্ষণ'। বেদে আছে মুক্তির অর্থ মৃত্যুরূপ বন্ধন হতে মুক্তি, কামনা হতে মুক্তি, বন্ধন হতে মুক্তি। আবার গীতায় পাপ হতে মুক্তি, কর্ম বন্ধন হতে মুক্তি, জড়ামরণ হতে মুক্তির উল্লেখ আছে। মহাভারতে বাসনার নিবৃত্তিকে মোক্ষ বলা হয়েছে।

যাইহোক মুক্তি বা মোক্ষলাভ হলে বন্ধন ছিল বলে ধরে নিতে হবে। বন্ধন না থাকলে মুক্তির কোন অর্থই হয় না। এই বন্ধন হতে নিষ্কৃতির নামই মুক্তি।

ভারতীয় দর্শনে 'মুক্তি' শব্দটিকে বিভিন্ন সম্প্রদায় বিভিন্ন নামে অভিহিত করেছেন। যেমন- মোক্ষ,নির্বাণ, কৈবল্য, অপবর্গ, নিঃশ্রেয়স প্রভৃতি।

চার্বাক দর্শন মতে মুক্তি

চার্বাক ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত সম্প্রদায়ই মোক্ষকে পরম পুরুষার্থ বলে স্বীকার করেছেন। চার্বাকদের মতে 'চৈতন্যবিশিষ্ট দেহই আত্মা'। সুতরাং এদের মতে,আত্মোপলব্ধি মানে দেহ -সম্ভোগ। দৈহিক বা ইন্দ্রিয়সুখই জীবনের পরম পুরুষার্থ।আর মুক্তি বলতে যদি আত্মার মুক্তি হয়, তাহলে তা একেবারেই অসম্ভব। কারন আত্মা বলে কোন পদার্থকে প্রত্যক্ষ করা যায় না।আর দুঃখের অত্যন্তিক নিবৃত্তিকেই যদি মুক্তি বলতে হয়, তাহলে তা একেবারেই অসম্ভব। কারণ সংসারে দুঃখ,বিরহ, মৃত্যু, রোগ-শোক সবই আছে। কিন্তু সুখ যে নেই --এমন কথা বলা যায় না। যদি সুখ না থাকত তাহলে মানুষ বাঁচতে চাইত না। সুতরাং সুখ যে দুঃখের চেয়ে অনেক বেশী, মিলন যে বিরহের চেয়ে অনেক দীর্ঘস্থায়ী -তা মানতেই হবে। জীবনে সুখ ও দুঃখ দুইই আছে। বুদ্ধিমানেরা সুখ ধারায় স্নান করবে, দুঃখ ধারার কাছে নিশ্চয়ই যাবে না। সুখই স্বর্গ, দুঃখই নরক। সুখ ও দুঃখ ছাড়া স্বর্গ ও নরক বলে কিছু নেই। বেদে যে স্বর্গ -নরকের কথা আছে, তাকে যেমন প্রত্যক্ষ করা যায় না তেমনি তার অস্তিত্বেরও প্রমান নেই। ভণ্ড পুরোহিত সম্প্রদায় নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য সাধারণ মানুষকে স্বর্গ, নরক, পাপ, পুণ্য প্রভৃতি অলৌকিক বস্তুর কথা শুনিয়ে এসেছে। কিন্তু বুদ্ধিমানেরা এসব কথা বিশ্বাস করবে না।

কাজেই জীবের তথা জীবনের পরম লক্ষ্য বা পুরুষার্থরূপে যদি কোন নীতির কথা বলতে হয় তাহলে সেই নীতিকে অবশ্যই দেহ সম্ভোগ বা ইন্দ্রিয় সুখ চরিতার্থের নীতি হতে হবে। কারন তারা বলেন দৈহিক সুখভোগই জীবনের পূর্ণতা দান করে। এই কারনে চার্বাকরা কাম বা দৈহিক সুখকে পরম পুরুষার্থ এবং তার সাধন অর্থকে গৌণ পুরুষার্থ বলেছেন।

চার্বাক মতে, জগতে যত রকমের সুখ আছে তার মধ্যে ইন্দ্রিয় সুখই সবচেয়ে বেশি স্পষ্ট, তীব্র ও বোধগম্য। জীবের স্বভাব হল সুখ সন্ধান ও দুঃখ পরিহার। জগতে পাপ, পুণ্য, স্বর্গ, নরক প্রভৃতির অস্তিত্ব নেই। জগতে যা আছে তা হল ধর্ম এবং এই ধর্মের সবটুকুই পুণ্য। এই ধর্ম শাস্ত্র নির্দিষ্ট ধর্ম নয়। এ হল জীবের এবং জীবনের স্বভাবধর্ম।

চার্বাকেরা মানুষে মানুষে কৃত্রিম ভেদাভেদ মানতেন না। তাদের মতে, ব্রাহ্মণে-চণ্ডালে আবার প্রভেদ কি? সকল মানুষই জীবনে অমৃতের সমান অধিকারী। এই কারনে চার্বাকদের মানবতাবাদী ও সাম্যবাদী বলা হয়। তাই চার্বাকরা বলেন, - "যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ"।[২]

অর্থাৎ যতদিন বাঁচবে সুখে বাঁচবে, প্রয়োজনে ঋণ করেও ঘি খাবে। দেহকেন্দ্রিক জীবনে সুখ লাভই অমৃত লাভ। পরকাল বলে কিছু নেই। জীবন একটাই। জন্মের মাধ্যমেই জীবনের শুরু আবার মৃত্যুতেই তার পরিসমাপ্তি।

পরিশেষে বলা যায়, চার্বাকরা জগৎকে দেখেছেন বস্তুবাদী দৃষ্টিতে, জীবকে দেখেছেন দৈহিক সত্তা রূপে। কিন্তু মানুষ কেবল দেহসর্বস্ব জীব নয়; বুদ্ধিমান ও মননশীল জীবও বটে। তাই সে অনুসন্ধান করে চলে এক পরম শান্তির, পরম কাম্য বস্তুর যাকে বলা হয় পরম পুরুষার্থ তথা মোক্ষ।

জৈন দর্শন মতে মুক্তি

জৈন দর্শনে জন্মজনিত জীবের নানা প্রকার দুঃখ কষ্ট ভোগকেই 'বন্ধন' বলা হয়েছে। এই দর্শনে দুঃখ কষ্ট জর্জরিত সংসারী আত্মাকেই 'জীব' বলা হয়েছে। জীবের এই সংসারী অবস্থা-ই হল বদ্ধাবস্থা। কিন্তু জীব বা আত্মা স্বরূপত নিত্য, শুদ্ধ, মুক্ত- অনন্ত জ্ঞান, অসীম শক্তি ও অপার আনন্দের অধিকারী প্রতিবন্ধকতাবশত বদ্ধাবস্থায় জীবের স্বরূপ আবৃত থাকে। এই প্রতিবন্ধকতার আবরণ উন্মোচন করতে পারলে জীব তথা আত্মা স্ব-স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে। জীবের স্ব -স্বরূপে অবস্থানই মুক্তি।

কিন্তু কি ভাবে জীব এই প্রতিবন্ধকতার আবরণ উন্মোচন করে মুক্তি লাভ করতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরে জৈন দর্শন সম্প্রদায় দুটি প্রক্রিয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। যথা- সংবর ও নির্জরা।'বন্ধন' বলতে জীবের সঙ্গে পুদ্গাল সংযোগ বোঝায় বলে 'মুক্তির' অর্থ হবে জীব থেকে পুদ্গাল বিয়োগ।জীবের মধ্যে নতুন পুদ্গালের আস্রব বা সঞ্চার বন্ধ করে এবং জীবের সঙ্গে যে পুদ্গালের পূর্বেই সংশ্লেষ হয়েছে তা দূর করে মুক্তি লাভ করা যায়। মুক্তি লাভের এই প্রথম প্রক্রিয়ার নাম সংবর ও দ্বিতীয় প্রক্রিয়ার নাম নির্জরা।

জৈন দর্শনে মোক্ষ লাভের উপায় নির্দেশ করতে গিয়ে--- 'তত্ত্বার্থধিগম সূত্রে'র সর্বপ্রথম সূত্রে উমাস্বামী বলেন- "সম্যগ্দর্শনজ্ঞানচরিত্রানি মোক্ষমার্গঃ"।[৩] অর্থাৎ সম্যক্ দর্শন, সম্যক্ জ্ঞান, ও সম্যক্ চরিত্র- এই তিনটি মার্গের সংযুক্তিই মোক্ষলাভের উপায়। এই তিনটি মার্গ একত্রে জৈন দর্শনে ত্রিরত্ন বা রত্নত্রয় নামে পরিচিত।এই তিনটি মার্গের সমন্বয়ের গুরুত্ব প্রতিপাদনের জন্য জৈনগন রোগ চিকিৎসার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন। রোগীর রোগ চিকিৎসার জন্য ওষুধের প্রকৃতি বা ক্ষমতা সম্বন্ধে চিকিৎসকের জ্ঞান, চিকিৎসকের প্রতি আস্থা ও ওষুধ সেবন প্রয়োজন। তেমনি মুক্তিকামী ব্যক্তির পক্ষে তীর্থঙ্করদের উপলব্ধ সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা, সত্য সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান এবং সত্যের আলোকে সৎ আচরণ করা প্রয়োজন।

সম্যক্ দর্শন:- সম্যক্ দর্শন হল তীর্থঙ্করদের উপলব্ধ সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা। ভারতীয় ঐতিহ্যে জ্ঞানের প্রথম ধাপই হল শ্রদ্ধা (শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্)। জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল না হলে কোন জ্ঞানই লাভ হয় না। তবে তীর্থঙ্কর বা মুনি-ঋষিরা যা বলেছেন তা অন্ধভাবে অনুসরনের নির্দেশ কোন দর্শনে নেই। শ্রদ্ধা হল যুক্তি, বিচার ও মননের দ্বারা কথিত তত্ত্বে বিশ্বাস এবং কথিত তত্ত্বের বিপরীত তত্ত্বের প্রতি অভিনিবেশ পরিত্যাগ।

সম্যক্ জ্ঞান:- সম্যক্ জ্ঞান বলতে জীব ও অজীব সম্বন্ধে সংশয়, ভ্রম ও অনিশ্চয়তা মুক্ত বিশদ জ্ঞান বোঝায়। কতকগুলি কর্ম রয়েছে যা সম্যক্ জ্ঞান লাভের পক্ষে অনুকূল নয়। মোক্ষ লাভে পিপাসু ব্যক্তি সেই সমস্ত কর্মের প্রতিবন্ধকতা দূর করে কেবলজ্ঞান লাভের চেষ্টা করবেন।

সম্যক্ চরিত্র:- যে সব কর্ম আত্মার বন্ধনের কারণ, সেই সব কর্ম পরিত্যাগ এবং শ্রদ্ধাবান ও জ্ঞানবান পুরুষের পক্ষে মোক্ষ লাভের সহায়ক কর্মের অনুশীলনই সম্যক্ চরিত্র। আর এই সম্যক্ চরিত্র লাভের জন্য জৈন দর্শনে পাঁচটি ব্রত পালনের নির্দেশ রয়েছে।এই পঞ্চমহাব্রত হল –অহিংসা,সত্য,অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য এবং অপরিগ্রহ। জৈনগন এই পাঁচ প্রকার কর্মকে মোক্ষলাভের সহায়ক বলেছেন। 'অহিংসা' বলতে বোঝানো হয়েছে গতিমান ও গতিহীন সকল প্রকার জীবের প্রতি হিংসা বা অনিষ্ট থেকে বিরত থাকা। 'সত্য' বলতে বোঝানো হয়েছে যা মিথ্যা নয় অর্থাৎ প্রিয়,হিতকর ও যথার্থ বাক্য প্রয়োগ। যদি কোন বাক্য জীবের অনিষ্ট বা জীবনহানি ঘটায় তাহলে সে বাক্যকে সত্য বলা যাবে না।'অস্তেয়' বলতে বোঝানো হয়েছে দান ব্যতীত অন্য কোন ভাবে পরদ্রব্য গ্রহন না করা অর্থাৎ অচৌর্যবৃত্তি। এর দ্বারা চুরি, প্রতারণা প্রভৃতি অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'ব্রহ্মচর্য' বলতে সাধারনত যৌনসম্ভোগ থেকে বিরত থাকাকেই বোঝানো হয়।কিন্তু জৈন দর্শনে সকল প্রকার সম্ভোগ থেকে বিরত থাকাকেই ব্রহ্মচর্য বলা হয়েছে। ব্রহ্মচর্য হল অন্তরে ও বাইরে পরিপূর্ণ সংযম অর্থাৎ সমস্ত রকম কামের নিরোধ। 'অপরিগ্রহ ' বলতে বোঝায় সমস্ত প্রকার মোহ বা আসক্তি ত্যাগ। বিষয়ের প্রতি আসক্তি থেকেই জীবের দেহ ধারণ ও বন্ধন হয়। সুতরাং মোক্ষ পিপাসু জীবকে সমস্ত প্রকার আসক্তি ত্যাগ করতে হবে।গৃহী ও সন্ন্যাসী উভয়কেই উক্ত পঞ্চব্রত পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে জৈন দর্শনে। তবে একজন সন্ন্যাসীর পক্ষে এই পাঁচটি ব্রত যত কঠোর ও পরিপূর্ণভাবে পালন করা সম্ভব, একজন গৃহীর পক্ষে ততটা সম্ভব নয়। এজন্য জৈনগণ গৃহীর জন্য এই পাঁচটি ব্রতের একটা সহজ ও শিথিল রূপের নির্দেশ দিয়েছেন। গৃহীদের পালনীয় এই সহজ ও শিথিল রূপকে বলা হয় অনুব্রত।

এভাবে সম্যক্ দর্শন, সম্যক্ জ্ঞান ও সম্যক্ চরিত্রের সুসামঞ্জস্য অনুশীলনের দ্বারা জীব তার সঞ্চিত ও সঞ্চিয়মান কর্ম-পুদ্গালবন্ধন ছিন্ন করে স্ব -স্বরূপে অধিষ্ঠিত হয়। পুদ্গাল বন্ধন ছিন্ন করার সাধনাই হল মোক্ষ সাধনা এবং পুদ্গাল বন্ধন মোচনই হল মুক্তি। মোক্ষ প্রাপ্ত জীবকেই জৈন দর্শনে 'অর্হৎ 'বলা হয়। যে অবস্থায় জীবের মধ্যে অহংবোধ সরে গিয়ে সে স্বরূপে অবস্থান করে।

বৌদ্ধ দর্শন মতে মুক্তি

বৌদ্ধ দর্শনে 'মুক্তি' কে নির্বাণ বলে অভিহিত করা হয়েছে। বুদ্ধদেব যে চারটি মহান সত্যের উপলব্ধি করেছিলেন তার প্রথম আর্যসত্যে বলা হয়েছে 'দুঃখ আছে'। দ্বিতীয় আর্যসত্যে বলা হয়েছে 'এই সমস্ত দুঃখের কারণ ও আছে'। তৃতীয় আর্যসত্যে বলা হয়েছে 'দুঃখের নিরোধ তথা নিবৃত্তি সম্ভব'। চতুর্থ আর্যসত্যে বলা হয়েছে 'দুঃখ নিবৃত্তির উপায় আছে '। বুদ্ধদেব উপলব্ধি করেছিলেন উৎপন্ন বস্তু মাত্রেরই বিনাশ আছে। দুঃখ যেহেতু উৎপন্ন কার্য বস্তু সেহেতু দুঃখেরও বিনাশ আছে। দ্বিতীয় আর্যসত্যে দুঃখের যে কারণ-শৃঙ্খলের কথা বলা হয়েছে সেই কারন –শৃঙ্খলের বিনাশে দুঃখের বিনাশ হয়। অবিদ্যা যেহেতু দুঃখের মুল কারন, সেহেতু দুঃখের বিনাশের জন্য অবিদ্যার বিনাশ সর্বাগ্রে প্রয়োজন। অবিদ্যার বিনাশ হলে ক্রমে ক্রমে দুঃখেরও বিনাশ হয়। এইভাবে দুঃখের যে নিবৃত্তি হয় সেই নিবৃত্তিতে আর কখনও ছেদ পরে না। ফলে জীবনে দুঃখ আর কখনই আবির্ভূত হতে পারে না। দুঃখের এইরূপ আত্যন্তিক নিরোধকে বলা হয় নির্বাণ।

'নির্বাণ' শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল নিভে যাওয়া। তৃণ বা কাঠ পুড়ে গেলে যেমন আগুন নিভে যায় তেমনি কামনা-বাসনার চির বিলুপ্তিতে দুঃখেরও চির অবসান হয় অর্থাৎ নির্বাণ লাভ হয়।'নিভে যাওয়া' অর্থে গ্রহন করলে 'নির্বাণ' শব্দে জীবন-দীপ নির্বাণ বা ধ্বংস বোঝায়।'শীতল হওয়া' অর্থে গ্রহন করলে 'নির্বাণ' বলতে বোঝায় জীবন-জ্বালা শীতল হওয়া বা জীবনে দুঃখের চির সমাপ্তি। দ্বিতীয় অর্থেই বৌদ্ধ দর্শনে নির্বাণ শব্দটিকে গ্রহন করা হয়।

বৌদ্ধ মতে নির্বাণ কখনই সত্তার বিলোপ নয়। নির্বাণ হল কামনা বাসনার বিলোপ। মুক্ত অবস্থায় জীবের দেহ থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে। দেহ থাকাকালীন অবস্থায় জীবের যে মুক্তি তাকে বলা হয় জীবন্মুক্তি। আর দেহের বিনাশের পর যে মুক্তি তাকে বলা হয় বিদেহ মুক্তি।

আবার নির্বাণ কর্মশূণ্য বা কর্মহীন অবস্থাও নয়। কারন নির্বাণ লাভের পর বুদ্ধদেব যে দীর্ঘদিন বেঁচে ছিলেন, সেই সময় তিনি কর্মহীন জীবন যাপন করেন নি। সাধনার ফলে দুঃখ নিবৃত্তির যে পথের সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন তা আপামর জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করে সর্বপ্রকার দুঃখ থেকে জীবকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বুদ্ধদেবের এই কর্ম ছিল নিষ্কাম কর্ম। নিষ্কাম কর্মের কোন ফল উৎপাদিত হয় না। আর এই কর্মের স্থান জীবের জীবনে আমরণ বর্তমান থাকে।

নির্বাণকে পরম সুখকর অবস্থাও বলা যায় না। কারন সুখ হল ভোগের ব্যাপার। কামনা-বাসনা শূণ্য অবস্থায় ভোগের কোন অবকাশ থাকতে পারে না। বৌদ্ধ সন্ন্যাসী নাগসেন মিলিন্দকে নির্বাণের অবস্থা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, কোন উপমা দিয়েই নির্বাণকে বোঝানো যায় না। নির্বাণের স্বরূপ বোঝাতে গিয়ে পর্বত,সমুদ্র প্রভৃতি উপমা ব্যবহার করা হয়। কিন্তু ভাবাত্মক কোন উপমাই নির্বাণকে বর্ণনা করার পক্ষে পর্যাপ্ত নয়; বরং অভাবাত্মক বর্ণনার মাধ্যমেই নির্বাণকে বোঝা সহজ। নির্বাণ জরা-মরণাদির অভাবরূপ এক স্বস্তির অবস্থা।

চতুর্থ আর্যসত্যে বুদ্ধদেব ভবচক্রের আবর্তন থেকে মুক্তির উপায় হিসাবে আটটি মার্গ বা পথের নির্দেশ দিয়েছেন। এই আটটি মার্গ হল, -

১। সম্যক্ দৃষ্টি- চারটি আর্যসত্য সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানই সম্যক্ দৃষ্টি।
২। সম্যক্ সংকল্প -সত্য জ্ঞানলাভ করে সেইমতো জীবন যাপনের দৃঢ় ইচ্ছাই সম্যক্ সংকল্প।
৩।সম্যক্ বাক্ - মিথ্যা ভাষণ পরিত্যাগ করে সদা সত্য কথন হচ্ছে সম্যক্ বাক্।এই অর্থে
অসার বাক্ -চপলতা, কটু বাক্য, পরনিন্দা পরিহার করতে হবে।
৪। সম্যক্ কর্মান্ত–সৎকর্ম, সদাচার প্রতিপালন, জীবহত্যা, স্বার্থপর কর্ম ও অবৈধ ইন্দ্রিয় সম্ভোগ থেকে বিরত থাকাই সম্যক্ কর্মান্ত।
৫। সম্যক্ আজীব - জীবন ধারনের জন্য যা কিছু প্রয়োজন তা সৎভাবে অর্জন করাই হল সম্যক্ আজীব।
৬। সম্যক্ ব্যায়াম - সৎ চিন্তা ও সৎ প্রবৃত্তির অনুশীলনকে বলা হয় সম্যক্ ব্যায়াম।
৭। সম্যক্ স্মৃতি - বুদ্ধদেব নির্দেশিত চারটি আর্যসত্যের সম্যক্ জ্ঞান সর্বদা স্মরণে রাখাই হল সম্যক্ স্মৃতি।
৮। সম্যক্ সমাধি - উপরিউক্ত সাতটি মার্গ যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হলে সাধকের চিত্ত শান্ত হয় এবং সে সমাধির সামর্থ্য লাভ করে। সমাধিতেই সাধক নির্বাণ লাভ করে। সমাধির আবার চারটি স্তর আছে। প্রথম স্তরে - নির্বাণার্থী সত্য সম্বন্ধে বিচার- বিতর্কের মাধ্যমে এক সুখকর ও আনন্দময় অবস্থায় অবস্থান করেন। দ্বিতীয় স্তরে –নির্বাণার্থীর চিত্ত বিচার- বিতর্ককে অতিক্রম করে আর্যসত্য চতুষ্টয়ে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে। এই অবস্থাতেও সাধকের চিত্তে আনন্দ ও শান্তির বোধ থাকে। তৃতীয় স্তরে - সুখানুভূতি ও আনন্দের প্রতি সাধকের ঔদাসীন্য দেখা দেয়, যদিও আত্মচেতনা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় না। চতুর্থ স্তরে - সাধক সম্পূর্ণভাবে আত্ম সমাহিত হয়, -কোন রূপ অনুভূতিই আর থাকে না। এ এক তুরীয় অবস্থা, পরিপূর্ণ জ্ঞানের অবস্থা –এই অবস্থাতেই সাধক নির্বাণ লাভ করেন।

দুঃখ-নিরোধ মার্গের উপরিউক্ত স্তর গুলিতে নির্বাণ লাভের জন্য যে উপদেশ নির্দেশিত হয়েছে তা প্রজ্ঞা, শীল ও সমাধির উপদেশ। সম্যক্ দৃষ্টিই হল প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞার দ্বারাই অবিদ্যা বিনষ্ট হয় এবং নির্বাণার্থী সম্যক্ সংকল্পাদির দ্বারা সমাধিস্তরে উপনীত হন। সম্যক্ সংকল্প, সম্যক্ বাক, সম্যক্ কর্মান্ত, সম্যক্ আজীব ও সম্যক্ স্মৃতি –এই পাঁচটিকে একত্রে বলা হয় পঞ্চশীল। শীলের দ্বারা চিত্তশুদ্ধির পর সমাধির দ্বারা নির্বাণ লাভ হয়।

বুদ্ধদেবের মতে সম্যক্ আজীব সন্ন্যাসী ও গৃহী উভয়ের জন্য একই রকম নয়। নির্বাণ সাধারনভাবে সন্ন্যাসীদের লভ্য। আর সেই জন্যই তিনি অতিরিক্ত কৃচ্ছ্রসাধনের পথ পরিত্যাগ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। বুদ্ধদেব বলেছেন, পরিপূর্ণ অমিতাচার যেমন দুঃখের নিদান, তেমনই অতিরিক্ত আত্মনিগ্রহ ও দুঃখদায়ক। সুতরাং এই দুই আতিশয্যের পথই ত্যাগ করতে হবে। জ্ঞানী এই দুটি পথই পরিহার করে মধ্যম পথ অনুসরণ করে, আর এই পথই নির্বাণের পথ। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, গ্রীক দার্শনিক অ্যারিষ্টটলও নীতির ক্ষেত্রে মধ্যম পথ অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন।

ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে মুক্তি লাভের জন্য মূলত তিনটি পথের উল্লেখ করা হয়েছে; যথা- জ্ঞানের পথ, কর্মের পথ এবং ভক্তির পথ। মনস্তত্ব অনুসারে মানব মনের তিনটি প্রধান বৃত্তি আছে; যথা -জ্ঞান, অনুভূতি ও ইচ্ছা বা সংকল্প। এই তিনটি বৃত্তির তারতম্য অনুসারে ব্যক্তির চরিত্রগত তারতম্য দেখা দেয়। যারা জ্ঞান প্রবণ তাঁরা জ্ঞানমার্গী অর্থাৎ তাঁরা জ্ঞানের পথ ধরে পরমার্থ লাভে আগ্রহী হন। যারা ভক্তি প্রবণ তাঁরা ভক্তিমার্গী অর্থাৎ তাঁরা ভক্তির পথ ধরে পরমার্থ লাভে আগ্রহী হন। আর যারা ইচ্ছা বা সংকল্প প্রবণ তাঁরা কর্মমার্গী অর্থাৎ তাঁরা কর্মের পথ ধরে পরমার্থ লাভে আগ্রহী হন। তবে প্রবনতা অনুসারে মার্গ বা পথ ভিন্ন ভিন্ন হলেও লক্ষ্য অভিন্নই থাকে -- সমস্ত পথের চরম অভীষ্ট বা লক্ষ্য হল মুক্তি।

পরিশেষে পৃথিবীর সর্বজন শ্রদ্ধেয় সিদ্ধিসাধক রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কথা উল্লেখ করতে হয়। তিনি নিজে প্রত্যেক মতের সাধনা করে দেখিয়েছিলেন যে, প্রত্যেক সাধনার দ্বারাই যথার্থ শ্রেয়োলাভ সম্ভব। এজন্যই তিনি বলেছিলেন - "যত মত, তত পথ"।[৪]

যে কোন দর্শনে মুক্তির স্বরূপ যা-ই আলোচনা হোক না কেন। সেই দর্শনের অন্তরালে যে নীতিতত্ত্ব লুকিয়ে থাকে তা তার পুরুষের মুক্তির পরম সিঁড়ি। চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনে যে নীতিতত্ত্বের উল্লেখ মেলে তা ব্যবহারিক জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এমন কি জীবন যখন নীতিতত্ত্বের আলোয় আলোকিত হয় তখন তা দর্শনে পরিণত হয়।

তথ্যসূত্র:

১। গীতা ৩/৩০।
২। চার্বাক দর্শনম্।
৩। তত্ত্বার্থসূত্রম্।
৪। কথামৃত, শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ।

গ্রন্থপঞ্জী:

১। চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ, লোকায়ত দর্শন।
২। চক্রবর্তী, সত্যজ্যোতি, সর্বদর্শন সংগ্রহ, অনুবাদ।
৩। চক্রবর্তী, নীরদবরণ, ভারতীয় দর্শন, দত্ত পাবলিশার্স, সপ্তম সংস্করণ, জানুয়ারী ২০০১।
৪। ভট্টাচার্য, সমরেন্দ্র,ভারতীয় দর্শন,বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৯।
৫। মণ্ডল, প্রদ্যোত কুমার, ভারতীয় দর্শন, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলিকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ২০১৬।
৬। শাস্ত্রী,দক্ষিণারঞ্জন, চার্বাক দর্শন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯৮৯।
৭। সেন, দেবব্রত, ভারতীয় দর্শন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৪।
৮। সেন, রণব্রত, ধম্মপদ বাংলা অনুবাদ, হরফ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৮।
৯। **Chatterjee, S . C . and Dutta D . M ., An Introduction To Indian Philosophy.**

১০। Hiriyanna. M, Outlines of **Indian Philosophy**.